তৃতীয় সিনেমা

অলোক চট্টোপাধ্যায়

এক

তৃতীয় সিনেমা! আগে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমাও ছিল বা আছে? সিনেমার ক্ষেত্রে এইরকম ক্রমবিভাগের অস্তিত্ব ষাটের দশকের আগে জানা ছিল না। ১৮৯৫ সালে জন্ম, অর্থাৎ প্রায় সোয়াশো বছরের ইতিহাসে সিনেমার তিনটি পর্বকে এখানে চিহ্নিত করা হচ্ছে। চতুর্থ সিনেমার কথাও বলছেন কেউ কেউ।

সিনেমা একটা কম্পোজিট আর্ট — সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্য, নৃত্যশিল্প ইত্যাদি সমস্ত কলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌগ। শুধু ছবি ও চলমান ছবি নয়, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমগুলির আত্মীকরণেই বেড়ে উঠেছে সিনেমা। অন্য শিল্পমাধ্যমগুলির তুলনায় বয়সে নিতান্ত শিশু, সিনেমা এই অল্প সময়েই গড়ে তুলেছে অতুল বৈভব। অর্জন করেছে বিবিধ অভিধা। কখনও বলা হয়েছে সিনেমা একটা ম্যাজিক — আ টেকনোলজিক্যাল মার্ভেল, সেরা প্রমোদ মাধ্যম। লেনিন বললেন, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যম — সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম, ইতিহাসের ধারক, সংগ্রামের হাতিয়ার, এক অনন্য শিল্পমাধ্যম আরও কত কী! তাদেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ লক্ষণ ধরে নিয়ে পর্বান্তর চিহ্নিত হয়েছে। সেভাবেই প্রথম ও দ্বিতীয়। ৬০-এর দশকের শেষার্ধে তৃতীয় সিনেমা।

প্রথম অবশ্যই মেইনস্ট্রিম হলিউড সিনেমা। মূলতঃ জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবি। ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ও সঙ্গে হলিউড চলচ্চিত্রের আগ্রাসনে সিনেমার দেশীয় সীমারেখাগুলি দ্রুত মুছে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে হলিউড মডেল হয়ে উঠেছে সর্বত্র। এরই বিরুদ্ধে ইয়োরোপে দ্বিতীয় সিনেমার (Auteur Cinema) আবির্ভাব।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ ইয়োরোপীয়ান আর্ট সিনেমা যা এলিট সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে — মূলতঃ বাস্তব বিমুখ। অবশ্য সেটাই দ্বিতীয় সিনেমার লক্ষণ নয়। বাস্তবকে আশ্রয় করে নয়াবাস্তব সিনেমা তো ইতালিতেই সৃষ্টি। রোবার্তো রোসেলিনির ‘ওপেন সিটি রোমা’, ভিত্তেরি ডি সিকার ‘বাইসাইকেল থিফ’ ও লুচিনো ভিসকন্তির ‘ওসেসিয়নে’ তো সিনেমায় যুদ্ধ পরবর্তী যুগের বাস্তবতার ইউরোপীয় অবদান। ইউরোপীয় আর্ট সিনেমা নন্দনতাত্ত্বিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও ক্রিটিক্যাল বিচারধারার পরিসর সৃষ্টি করে।

আসলে তৃতীয় সিনেমার প্রবক্তাদের দৃষ্টিতে বাস্তবের অর্থ রাজনৈতিক বাস্তবতা। বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মানুষের যুদ্ধ ও লাগাতার সংগ্রামের রাজনীতিই তাঁদের কাছে একমাত্র বাস্তব। এককথায় তৃতীয় সিনেমা রাজনৈতিক সিনেমা। এভাবেই তৃতীয়

সিনেমার পরিচয় দিলেন আর্জেন্টিনার দুই পরিচালক ফার্নান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনো। প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার যাবতীয় উত্তরাধিকার অস্বীকার করে তাঁরাই পত্তন করেন তৃতীয় সিনেমার।

দুই

লাতিন আমেরিকা তৃতীয় সিনেমার জন্মভূমি। এখানেই তার বেড়ে ওঠা। ব্রাজিলের 'সিনেমা নোভো' বা নতুন সিনেমা এবং কিউবার 'সিনেমা অব লিবারেশন', তৃতীয় সিনেমারই অঙ্গ।

লাতিন আমেরিকার ছবির সঙ্গে ভারতীয় দর্শকের পরিচিতি নামমাত্র। সেটুকুও আবার ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লাতিন আমেরিকার ছবি বলতে এতাবৎ কিউবা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি ও মেক্সিকোর গুটিকয়েক ছবির অভিজ্ঞতা সম্বল। T G Alea-র ছবির মাধ্যমে কিউবা, Costa Gavras-এর ছবির মাধ্যমে চিলি — এই ছিল অভিজ্ঞতার পুঁজি। চিলির নির্বাসিত পরিচালক Miguel Littin ও Raul Ruiz-এর নাম অনেকেরই জানা, কিন্তু জানা ছিল না তাঁদের কাজ দিয়েই সেখানকার চলচ্চিত্রের নয়া রূপকে বোঝা যাবে কিনা! দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতের দশম চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৮৫) একগুচ্ছ লাতিন আমেরিকার ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে সেই সুযোগটা করে দেয়। ভারতীয় দর্শকের কাছে অভিজ্ঞতাটা মহাদেশ আবিষ্কারের।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্রের মূল স্রোতকে বুঝতে ব্রাজিলের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ১৯৮২-তে ব্রাজিলে যে ৮২টি ছবি তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে ৬০টিতেই যৌনতা ছিল প্রধান উপজীব্য। বাকি ২২টির মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে সমসাময়িক সমস্যা স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক সমস্যার ছবি ছিল মাত্র ২টি, ১৯৮১-তে যেখানে ছিল ৬টি। চলচ্চিত্রের এই মূল স্রোতের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা, চিলি, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়ার ডকুমেন্টারি খাতে উজানের স্রোতটাকেও চিনে নেওয়া দরকার — যে স্রোত থেকে জন্ম নিয়েছে এই মহাদেশের 'সিনেমা নোভো', যা তৃতীয় সিনেমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

একটা ঐতিহ্যচ্যুত অহমিকাহীন জাতিকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পদানত রাখা সহজ। লাতিন আমেরিকার নতুন সিনেমার স্রষ্টারা এ বিষয়ে সচেতন। নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে ও আইডেন্টিটির সংকট দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এর জন্য তাঁরা হাজির করেছেন এক 'ডাইরেক্ট' সিনেমা যা ষাটের দশকের 'সিনেমা নোভো' আন্দোলনের ফল।

মহাদেশ জুড়ে সামরিক জুনটা, অলিগারকি, ও নয়া উপনিবেশবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের সহায়ক হিসাবেই এর উৎপত্তি। এই সিনেমা জনগণের সার্বিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গ। নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর, গুয়াতেমালা, চিলি, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া — যেখানেই নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও তার আভ্যন্তরীণ দোসরদের দমন পীড়ন সেখানেই সিনেমা প্রতিরোধ আন্দোলনের এবং বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। বন্দুক ও ক্যামেরা হয়ে উঠেছে পরস্পরের দোসর। একটি ডকুমেন্টারিতে দেখা যায় সরকারি সৈন্যের আক্রমণের মুখে চলচ্চিত্রকার নিজের ক্যামেরা কৃষক রমণীর হাতে তুলে দিয়ে রাইফেল হাতে এগিয়ে যায়। চলচ্চিত্রকার ও রাজনৈতিক-সামরিক কর্মীর নিজস্ব গণ্ডি মুছে গিয়ে সবাই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় শরিক হয়ে যায়। নতুন সিনেমার এটাই tragic origin। এর স্রষ্টাদের নিরপেক্ষতার ভণ্ডামি নেই, সবাই পার্টিজান। এই সিনেমা প্রকার ও প্রকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় ইনহিবিশনকে বিপ্লবী মেজাজে অগ্রাহ্য করে। ডকুমেন্টারি ছবি হয়ে ওঠে শাণিত অস্ত্রের মতো। সিরিয়াস কাহিনিচিত্র মাত্রই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ছবি। লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের অবাধ ব্যবহার, রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন, ঔপনিবেশিকতার সার্বিক প্রতিরোধ, প্রয়োজনে দর্শকের ধৈর্যের উপর আঘাত, অসংযত ক্রোধ-ঘৃণা-ভাবাবেগ-যৌনতা সবমিলিয়ে এ এক উত্তাল সিনেমা।

আর্জেন্টিনার কবি-প্রাবন্ধিক-চলচ্চিত্রকার ‘ফার্নান্দো বিরি’র একটি দীর্ঘ কবিতা ‘নতুন সিনেমা’ বিষয়ক পোস্টার হিসাবে বহু ব্যবহৃত। কবিতায় নতুন সিনেমাকে বর্ণনা করা হয়েছে,

“One in diversity / Diverse in unity / One and universal” যা কিনা “Poetic political light revolution / And orgasm”। কেমন হবে নতুন সিনেমার চেহারা?

“And I think : National identity / Did the parrot need its national (critical)/ Identity / But ourselves, we do / We needed it : / For a national cinema / Realist / And critical / Later we added / Popular....” যার মূল লক্ষ্য হবে —

“Violent, serene / Liberation / From hunger / Of conscience.....”

এই সিনেমার স্রষ্টারা শুধু বৈপ্লবিক বিষয়ই উপস্থিত করতে চান না, বৈপ্লবিক আঙ্গিকেও তা পরিবেশন করতে চান। বিষয়ে ও আঙ্গিকের পৃথকীকরণকে তাঁরা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ফাঁদ বলে মনে করেন।

তিন

তৃতীয় সিনেমা গোত্রের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি ‘আওয়ার অফ দা ফার্নেসেস’ নামের বিশাল ডকুমেন্টারি। সোলানাস ও গেটিনোর পরিচালনায় তৈরি হল ১৯৬৮-তে। সেই সঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনা ও আদর্শের রূপ প্রকাশ পায় ‘টুওয়ার্ডস এ থার্ড’ (১৯৬৯) সিনেমা ইস্তাহারে। সিনেমায় ত্রিমহাদেশীয় বিপ্লবের (Tricontinental Revolution) লক্ষ্য ঘোষিত হয়।

তৃতীয় সিনেমার ছবিগুলি সংশ্লিষ্ট দেশজ চৈতন্যকেই শুধু প্রতিফলিত করে তা নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার ও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেই তাঁরা দেখেছিলেন সিনেমাকে। তৃতীয় বিশ্বের সিনেমাকেও তৃতীয় সিনেমা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা অতিসরলীকরণ মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়নের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশেই বিদ্যমান। সেই বিচারে লাতিন আমেরিকা ছাড়িয়ে তৃতীয় সিনেমার ক্ষেত্র আরও পরিব্যাপ্ত — আফ্রিকা-এশিয়া সহ সমগ্র তৃতীয় বিশ্বেই। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে ত্রিমহাদেশীয় বিপ্লবই তৃতীয় সিনেমার আদর্শ ও লক্ষ্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমাজবাস্তবকে ডকুমেন্টারি ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা হয়ে উঠল তৃতীয় সিনেমার ব্রত। আর্জেন্টিনা, চিলি, আলজেরিয়া থেকে এবং সাগরের অপর পার থেকে উঠে আসতে থাকল ব্ল্যাক আমেরিকান ডকুমেন্টারি।

আত্মসচেতন এই ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রথম সিনেমা বা হলিউড সিনেমার আদর্শগত বিরুদ্ধাচরণ। একইসঙ্গে তারা বৈপ্লবিক নন্দনতত্ত্বের ত্রিমহাদেশীয় সংজ্ঞায় ফিল্মে জাতীয় সীমারেখার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। যদিও জাতীয় এমনকি আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে তৈরি ফিল্মও তৃতীয় সিনেমা গোত্রের অঙ্গীভূত।

সোলানাস ও গেটিনো তাঁদের ম্যানিফেস্টো, ‘Towards the Third Cinema’-তে নির্দ্বিধায় তৃতীয় সিনেমার পরিচয় দেন “A cinema of liberation” বলে, যা প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে। ম্যানিফেস্টোতে তাঁরা বলেন, “Third Cinema is born out of concrete historical conditions of the third world. Its purpose is to intervene in the struggle against imperialism on the side of the people. It neither desires nor can it afford an aesthetic alibi or refuse in some pure realm untouched by history.”

তৃতীয় সিনেমার লক্ষ্য এমন এক সিনেমা সৃষ্টি করা যা সঠিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জীবনকে

প্রতিফলিত করবে, যা হয়ে উঠবে একটা সামাজিক কমেন্টারি যেখানে দারিদ্র্য, নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠে আসবে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মানুষ সম্পর্কে পশ্চিমী কিছু একঘেয়ে অনড় ধারণাকে (stereotypes) ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।

কিউবাতে তৃতীয় সিনেমা আন্দোলন শুরু হয় ষাটের দশকে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন দুই পরিচালক টমাস গুটিয়েরেজ আলিয়া ও জুলিও গার্সিয়া এসপিনোজা। যদিও ১৯৫০-এর দশকেই এই অভিধাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি চিত্রপরিচালকরা, প্রথম ও দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সিনেমাকে পৃথক করতে। তৃতীয় সিনেমা ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক এবং ডকুমেন্টারি। অথচ সোভিয়েত সমাজ বাস্তবতার প্রতি খুবই ক্রিটিক্যাল। একই সঙ্গে হলিউডের প্রতি চরম বিরুদ্ধভাবাপন্ন। চলচ্চিত্রকাররা উভয়ের অন্তর্নিহিত রাজনীতিকেই খারিজ করেন। টম ভিক-এর মতে সেটাই তৃতীয় সিনেমা যা “engage the struggle for national liberation.”। অর্থাৎ এই সিনেমার বিশ্বাস সিনেমাকে সমাজ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

তৃতীয় সিনেমার তাত্ত্বিক ভিত্তি ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে প্রকাশিত কয়েকটি ইস্তাহারে প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল ব্রাজিলের গ্লবেয়ার রোচার ‘Aesthetics of Hunger’ (১৯৬৫), ফার্নান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনোর ‘Towards a Third Cinema’ (১৯৬৯), জুলিও গার্সিয়া এসপিনোজার ‘For an Imperfect Cinema’ (১৯৬৯) এবং জর্জ সান্তিনেজ-এর ‘Problems of Form and Content in Revolutionary Cinema’ (১৯৭৬)।

চার

বিপ্লবোত্তর কিউবার ডকুমেন্টারি ছবির জনক সান্তিয়াগো আলভারেজ নতুন সিনেমার আদর্শ ও পথিকৃৎ। তাঁকে রাশিয়ার জিগা ভের্তভ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। অনেকে আবার কিউবার ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এ তাঁর কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ষাটের দশকের শেষ থেকে এঁদের হাতেই লাতিন আমেরিকার নতুন সিনেমা রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। অসাধারণ কিছু ডকুমেন্টারির মাধ্যমে। আর্জেন্টিনার সোলানাস ও গেটিনোর পরিচালনায় ‘Hour of the Furnaces’ (১৯৬৯), বলিভিয়ায় জর্জ সাঞ্জিনেস-এর ‘Blood of the Condor’ (১৯৬৯) এবং ‘Courage of the People’ তৈরি হল। ‘Letter from Marusia’ এবং ‘Jackle of Nahueltero’ পরিচালনা করলেন চিলির মিগুয়েল লিটিন। আলেন্দে সরকারের আমলের চিলির রূপান্তরের ডকুমেন্টারি দেখা গেল ‘When the People Awake’-এ। সামরিক অভ্যুত্থানে আলেন্দের পতনের উপর তিন অঙ্কে বিভক্ত সর্বকালের সেরা একটি ডকুমেন্টারি ‘Battle of Chile’ তৈরি হল প্যাট্রিসিও গুজমানের পরিচালনায়। আরও পরে পাওয়া গেল ব্রাজিলের জেলিটো ভিয়ান্নার ‘Terra dos Indios’ এবং গ্লবেয়ার রচার ‘A Idade da Terra’।

মধ্য আমেরিকা জুড়ে জনবিরোধী অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর তাণ্ডব নিকারাগুয়া-গুয়াতেমালা-এল সালভাদোরে যেমন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্ম দেয় তেমনি জন্ম দেয় বিপ্লবী সিনেমার। তৈরি হয় গুয়াতেমালাতে ‘When Mountains Tremble’ এবং এল সালভাদোরে ‘El Salvador - Another Vietnam’, ‘El Salvador - Revolution or Death’ এবং ‘A Time of Daring’। নিকারাগুয়াতে মার্কসিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল খ্রিস্টানরা বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সহযোদ্ধা হয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেল ‘Thank God and The Revolution’ এবং ‘From the Ashes, Nicaragua Today’-র মতো ডকুমেন্টারি।

এই ধরনের অধিকাংশ ছবির প্রযোজক-পরিচালকরা প্রকৃতপক্ষেই রাজনৈতিক (অনেক ক্ষেত্রে সামরিক)

কর্মী। প্রায়শই একটি গোষ্ঠী বা ফ্রন্ট একটি রাজনৈতিক মিশন হিসাবেই চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করে। গোপনে বিপজ্জনকভাবে তোলা এই 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ছবিগুলির কোনোটাতে দু'একজনের নাম পরিচালক হিসাবে থাকে, আবার কোনোটাতে থাকেও না।

১৯৬৬-৬৮-তে গোপনে তোলা আর্জেন্টিনার 'Hour of The Furnaces' ডকুমেন্টারি ছবির শক্তি ও সম্ভাবনার এক চূড়ান্ত উদাহরণ। Group Cine Liberation প্রযোজিত এবং ফার্নান্দো সোলানেস ও অক্টাভিও গ্যাটিনো পরিচালিত এপিক গুণসম্পন্ন এই ছবিটি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একটি ডকুমেন্টারি। পুরো ছবিটি দেখাতে গেলে একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে দেখাতে হত। এর প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্য ৩টি অংশে বিভক্ত করে চার ঘন্টা কুড়ি মিনিটে কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম অংশ 'Neo-colonialism and violence'। দ্বিতীয় অংশ আবার দুটি অংশে বিভক্ত : 'Chronicle of Peronism' এবং 'Chronicle of Resistance'। প্রেসিডেন্ট জুয়ান পেরন-এর উত্থান ও তাঁর শাসনকালের (১৯৪৪-৫৫) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংস্কার-এর নিউজ রীল দেখানো হয়েছে। কিন্তু পেরন অলিগারকির উচ্ছেদ না করে সমঝোতা করলেন। এই দুর্বলতাই তাঁকে গ্রিক ট্রাজেডির নায়কে পরিণত করে। দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতে পাই তাঁর পতন ও পেরনিস্ট প্রতিরোধ আন্দোলন।

ছবির তৃতীয় অংশ 'Violence and Liberation'-এ হিংসা ও মুক্তি সম্বন্ধীয় একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং জনগণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান হয়েছে। ছবিতে ক্যামেরা বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় দর্শককে। অসংখ্য সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে, অবাধে সংযোজিত হয়েছে নিউজ রীল। এ ছবি গণচেতনা উন্মেষ এবং প্রতিরোধের এক মহান দলিল, এক চাক্ষুষ ইতিহাস।

পাঁচ

তৃতীয় সিনেমায় উপনিবেশবাদ বিরোধিতা এবং একইসঙ্গে তার মধ্যেই অবস্থান করে তারই উৎসাদনের কর্মসূচি, যা একটা নয়া ঔপনিবেশিক দোটানার জন্ম দেয়। তৃতীয় সিনেমার এই ঐতিহাসিক অবস্থান-বৈপরীত্য সোলানাস গেটিনোদের ইস্তাহারে ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁদের মত 'প্রথম সিনেমায়' সিনেমাকে পণ্যে পরিণত করা হয়। এর বিকল্প সিনেমা সম্ভব। কিউবার Imperfect Cinema আন্দোলন, ইতালির 'সিনেগিয়রনালি লিবারি' ও জাপানের 'জেঙ্গাকুয়েন' তথ্যচিত্রগুলি তারই নিদর্শন।

প্যান আফ্রিকানিজম এবং ব্ল্যাক পাওয়ার আন্দোলনগুলির অভিমুখ হল তাদের সাংস্কৃতিক অস্মিতা, তাদের জাতীয় গৌরব ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। মহাদেশের তৃতীয় সিনেমা বিভিন্ন রূপে তার প্রকাশ ঘটাল : ডকুমেন্টারি ছবিতে যেমন যামা ফানাকার 'ব্ল্যাক সান' অথবা আভাঁ গার্দ স্টাইলে উসমান সেমবেনের 'বরম সারেট' দর্শককে রাজনীতিতে জড়িয়ে নেয় ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।

নতুন এই র‍্যাডিক্যাল তৃতীয় সিনেমা সম্পর্কে রোচা তাঁর ইস্তাহারে স্পষ্ট করলেন, চাই "hungry cinema...of sad, ugly films"। সোলানাস ও গেটিনো নির্দেশ দিলেন চলচ্চিত্রকারদের তৈরি করতে হবে, "militant guerilla documentaries"। এসপিনোজা প্রচার করলেন তাঁর Imperfect Cinema-র তত্ত্ব।

Imperfect Cinema অত্যন্ত সংকীর্ণ বাজেটে সাদা-কালোয় বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের বাস্তবিক ছবি তৈরি করবে সস্তায়, রোচার Aesthetic of Hunger এর অনুসারী হবে এই সিনেমা। ইমপারফেক্ট সিনেমা মনে পড়িয়ে দেয় জিগা ভের্তভের Kino Pravda-র (Cinema Truth) কথা। একই পদ্ধতি দেখা গেছে যুদ্ধ পরবর্তী ইতালিয়ান নয়াবাস্তব সিনেমায়।

হাংরি ও ইমপারফেক্ট সিনেমার সমান্তরালে সোলানাস-গ্যাটিনোদের তৃতীয় সিনেমার তত্ত্ব ডমিন্যান্ট সিনেমা ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় — 'সিনেমা অফ লিবারেশন'। যেখানে ক্যামেরা হয়ে যায় "image weapon" এবং প্রজেক্টার হয়ে ওঠে — "the propaganda gun", "a gun that can shoot 24 frames per second"। সোলানাস-গেটিনোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এইভাবে তৃতীয় সিনেমার উত্থান হয়ে উঠেছে "the most important revolutionary artistic event of our times."

ছয়

তৃতীয় সিনেমা একটি নমনীয় ধারণা। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ও উত্তর ইয়োরোপীয় দেশগুলির সিনেমা প্রথম সিনেমা বলে গণ্য হয়। দ্বিতীয় সিনেমার মধ্যে সোভিয়েত ও চিনের মত কমিউনিস্ট দেশগুলি ও পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির সিনেমাকে ধরা যায়। ভিন্ন মতে পশ্চিম ও উত্তর ইয়োরোপীয় সিনেমাকে দ্বিতীয় সিনেমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় সিনেমা যেখানে গভীরভাবে রাজনৈতিক, তৃতীয় বিশ্বের সিনেমার বৃহদাংশ তা নয়। বলিউডি সিনেমা উপনিবেশবাদ বিরোধী চরিত্র অর্জন করেনি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতেও সিনেমার চরিত্র একই। কিন্তু দরিদ্র ও নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবমূর্তির জন্য তৃতীয় বিশ্বের ছবিও তৃতীয় সিনেমার আত্মীয়তা অর্জন করে।

ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সিনেমাকে অন্তত আকারগত দিক থেকে আজ আর তুচ্ছ বলা যাবে না। তৃতীয় মিলেনিয়ামের শুরুতে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির একত্র উৎপাদন সংখ্যার তুলনায় তারাই সংখ্যাগুরু, বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক বড় অংশীদারই শুধু নয়। তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ততটা প্রকট না হলেও দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ও নিম্নবর্গীয় অবস্থান এবং নয়া উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তারাও তৃতীয় সিনেমার দোসর।

আর্জেন্টিনায় পূর্ণমাত্রায় উন্নত ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি আছে। বিপ্লবোত্তর কিউবা, আলজেরিয়া, সেনেগাল, ইন্দোনেশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের কেন্দ্রগুলি — ভারত, ইজিপ্ট, মেক্সিকো ও ব্রাজিল তৃতীয় বিশ্বের সিনেমার অন্তর্গত। অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার সঙ্গে, আফ্রিকা এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার উদীয়মান জাতীয় সিনেমার সবই তৃতীয় সিনেমার গোত্রভুক্ত। এক কথায় তিনটি মহাদেশের জাতীয় সিনেমাগুলির জটিল সমষ্টি এই তৃতীয় সিনেমা।

সাত

শেষে চতুর্থ বিশ্বের কথা উঠে আসে। যখন একটি মনুষ্যগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রহীন জাতি তাদের বিশেষ অবস্থার কারণে প্রথম-দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোন বিশ্বেরই ছাড়পত্র পায় না তখন তারাই চতুর্থ বিশ্ব। তাদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা, প্রান্তিকতা ও আইডেন্টিটির সংকট তাদের সিনেমায় যখন প্রতিফলিত হয় তখন সেটাই চতুর্থ সিনেমা। এই ধরনের মনুষ্য গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন ইয়োরোপে রোমা, উত্তর আমেরিকা এবং কানাডায় আদি আমেরিকান বা অ্যামেরিণ্ডিয়ান, মধ্য এশিয়ায় কুর্দ, চিনে তিব্বতি, অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষ প্রভৃতি। এই চতুর্থ বিশ্বের নিজস্ব কোন সিনেমাই গড়ে ওঠেনি। যদিও তাদের ইস্যুগুলি কখনও কখনও তৃতীয় সিনেমার মধ্যেই ধৃত হয়েছে। প্রথম-দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় সিনেমার সাহায্য ছাড়াই চতুর্থ সিনেমা গোত্রের প্রথম একটি কাহিনিচিত্রের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৮-তে। নেটিভ আমেরিকানদের তৈরি 'Smoke Signals' - ছবিটির পরিচালক Chris Eyre।

এখানে লেখক, প্রযোজক, অভিনেতা, সবাই এই রাষ্ট্রহীন গোষ্ঠীর মানুষ।

সিনেমাকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় গোত্রে পৃথক করার পরও লক্ষ্য করা যায়, একই ছবিতে প্রথমের সঙ্গে তৃতীয়ের উপস্থিতি। আবার দ্বিতীয়ের সঙ্গে প্রথম সিনেমার ফিউশনও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিনেমার একত্রে অবস্থানও কোনও কোনও ফিল্মে ঘটে। এভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন গোত্রের সিনেমার ওভারল্যাপিং-এর নমুনা বিস্তর। শুধু তাই নয়, ভিন্ন রাজনীতি ও আদর্শের সহাবস্থানও ঘটে।

সাম্প্রতিক একটি ছবিতে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ গোত্রের সিনেমার সংমিশ্রণও দেখা গেল : ২০০৪ সালে নির্মিত স্টিফেন স্পিলবার্গের ছবি ‘Terminal’-এ। ছবির মুখ্য চরিত্র ভিক্টর নাভোস্কি পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রে বর্তমানে (২০০৪) একটি অস্তিত্বহীন স্টেটের অধিবাসী। পাসপোর্টহীন মানুষটি JFK এয়ারপোর্টে ৭ বছর আটকে আছে। তার কোথাও যাওয়ার নেই। এই টার্মিনালটি প্রথম সিনেমার দ্যোতক। ছবিতে নৈরাজ্যের আবহের মধ্যে তৃতীয় সিনেমার উপস্থিতি স্পষ্ট। নাভোস্কির শেষ পরিণতি হয়, “an uncceptable citizen of a non-existent country” — চতুর্থ সিনেমার রাষ্ট্রহীন নাগরিক।

অলোক চট্টোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক এবং নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সান্ধ্য কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।